হলি আর্টিজানের পর...

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

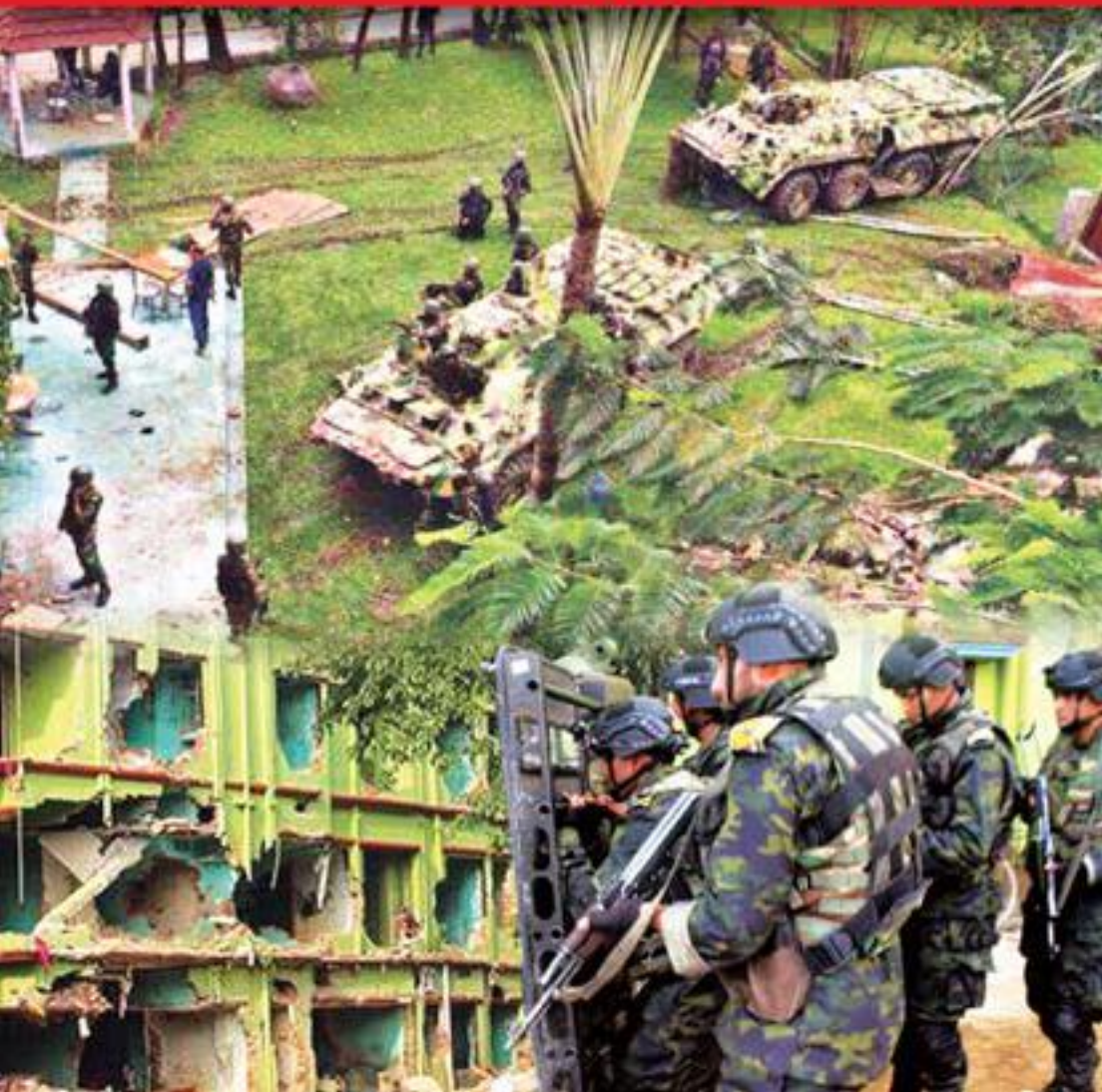

হলি আর্টিজানের পর...

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

হেযবুত তওহীদ

তওহীদ প্রকাশন

৩১/৩২, পি.কে. রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

হলি আর্টিজানের পর...
হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

প্রকাশক
তওহীদ প্রকাশন
৩১/৩২, পি.কে. রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন: ০১৬৭০-১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০-১৭৪৬৫১
www.hezbuttawheed.org

প্রকাশকাল: ২৫ জুলাই ২০১৭

ফেসবুক পেইজঃ
আসুন সিস্টেমটাকে পাল্টাই; facebook.com/systempaltai
জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আদর্শিক লড়াই; facebook.com/htiwot
সরাসরি ভিজিট করতে স্মার্ট ডিভাইস থেকে স্ক্যান করুন

মূল্য: ২০.০০ টাকা

হলি আর্টিজানের পর...

গুলশানে হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে জঙ্গি হামলার এক বছর পেরিয়ে গেল। ঘটনাটি এখনও নানা কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে আছে। কারণ ঐদিন বাংলাদেশের মানুষ প্রথমবারের মত এই ধরনের নৃশংস হামলার কবলে পড়ে, খবরের শিরোনাম হয় বিশ্বব্যাপী। ২০১৬ সালের জুলাই এর এক তারিখের মধ্যরাত থেকে শুরু করে দুই তারিখ সারাদিন দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমের প্রধান খবরটিই ছিল- 'গুলশানের হলি আর্টিজান নামের রেস্টুরেন্টে জঙ্গি হামলা'। ১লা জুলাই রাতেই জঙ্গিরা ২০ জনকে হত্যা করে যাদের মধ্যে ১৭ জন ছিলেন বিদেশি নাগরিক। তিন জন বাংলাদেশি। এছাড়া সন্ত্রাসীদের হামলায় দু'জন পুলিশও প্রাণ হারান। পরের দিন সকালে সেনাবাহিনীর কমান্ডো অভিযানে ছয় জন নিহত হয়। আইএস এর পক্ষ থেকে এদের মধ্যে পাঁচজনকে তাদের সদস্য বলে দাবি করা হয়।

হলি আর্টিজানের মর্মান্তিক ঐ ঘটনার পর বেশ কিছুদিন দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকায় অনেকে ভেবেছিলেন জঙ্গিবাদের হুমকি বোধহয় মোকাবেলা করাই গেল। কিন্তু বলা বাহুল্য, কিছুদিন স্তিমিত থাকার পর পুনরায় জঙ্গিবাদের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙ্গে জঙ্গিরা 'আত্মঘাতী' হামলার পথ বেছে নিয়েছে, যেমনটা সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, লিবিয়া, ইয়েমেন ইত্যাদি দেশের প্রাত্যহিক ঘটনা। একের পর এক জঙ্গি হামলা, জঙ্গি আস্তানায় পুলিশের অভিযান এবং হতাহতের ঘটনায় সারা দেশের মানুষ আজ বিস্মিত, হতবাক। র‍্যাব ডিজি তো বলেই ফেললেন, 'আমরা এক প্রকার যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।'

এই আশঙ্কা আমরা হেযবুত তওহীদ কয়েক বছর আগে থেকেই প্রকাশ করে আসছিলাম। আমরা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করে, হ্যান্ডবিল, পুস্তিকা, ম্যাগাজিন, বই লিখে, প্রামাণ্যচিত্র বানিয়ে সেগুলো প্রচার করে, ৮০ হাজারেরও বেশি সেমিনার, র‍্যালি, পথসভা, জনসভা ইত্যাদি করে এই আশঙ্কা ব্যক্ত করে এসেছি যে, যেভাবে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলো ষড়যন্ত্র শুরু করেছে, একটার পর একটা মুসলিমপ্রধান দেশকে টার্গেট করে শেষ করে দিচ্ছে, আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকেও

টার্গেট করা তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর তার জন্য জঙ্গিবাদই যে সবচেয়ে কার্যকরী হাতিয়ার হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের সেই আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। এখন আর যুক্তি, তথ্য, উপাত্ত দিয়ে কোনোকিছু প্রমাণ করার দরকার নেই। উদ্ভূত পরিস্থিতি আমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি।

- *গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে রংপুরের পীরগাছায় আয়োজিত জঙ্গিবাদবিরোধী এক বিশাল জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে ভাষণ প্রদান করে হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম।*

জঙ্গিবাদের উত্থান হলো কীভাবে?

আপাতদৃষ্টিতে জঙ্গিবাদকে ইসলামের নামে চালিয়ে দেওয়া হলেও আমরা যদি এর গোড়াতে যাই তাহলে দেখতে পাব জঙ্গিবাদের জন্য ইসলাম দায়ী নয়। আশির দশকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে সেনা পাঠায়। তখন পুঁজিবাদী আমেরিকা দেখল আফগানিস্তানের ধর্মপ্রাণ মুসলিমদেরকে নাস্তিক্যবাদী কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে খুব সহজেই জিহাদের কথা বলে উদ্বুদ্ধ করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধরাশায়ী করা সম্ভব। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তারা আরবীয় মিত্র দেশগুলোর সহযোগে মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে এমন কিছু ধর্মব্যবসায়ী ভাড়া করল যাদের দায়িত্ব ছিল মুসলিম তরুণদেরকে জিহাদের কথা বলে উদ্বুদ্ধ করে আফগানিস্তানের যুদ্ধভূমিতে যেতে উৎসাহিত করা। তাদের কথায় উৎসাহিত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার তরুণ আফগানিস্তানে ছুটে গেল 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ' করার জন্য। আর পর্দার আড়াল থেকে তাদের অস্ত্র, অর্থ ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করে গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরাজিত ও বিতাড়িত হলেও এই 'জিহাদী চেতনা' কিন্তু শেষ হলো না বরং আরও ধারালো হলো। কথিত জিহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই

লোকগুলো নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে ছোট ছোট দল গঠন করল নিজেদের দেশে কিতাল করার উদ্দেশ্যে। সে সময় আমাদের বাংলাদেশেও রাজপথে স্লোগান দেওয়া হয়েছিল 'আমরা হব তালেবান, বাংলা হবে আফগান'। এদিকে ফিলিস্তিন, জিনজিয়াং, কাশ্মীরসহ পৃথিবীর যেখানে যেখানে মুসলিমরা দুর্দশার মধ্যে রয়েছে সেখানেও আফগানফেরত ঐ সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণরা জিহাদী চেতনায় ছুটে যেতে লাগল, হামলা-পাল্টা হামলা চালাতে থাকল। শুরু হলো একদিকে জঙ্গিবাদী তাণ্ডব, অন্যদিকে জঙ্গি দমনের নামে দেশ দখলের মহোৎসব। টুইন টাওয়ারে হামলা হলো, আফগানিস্তানের পর ইরাক দখল করে নেওয়া হলো। লক্ষ লক্ষ মুসলিমের রক্ত ঝরল মার্কিন সেনার হাতে। এসব অন্যায়-অবিচার দেখে আরও হাজার হাজার তরুণ জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু এই তরুণরা ভুলটা কোথায় করল সে আলোচনায় পরে আসছি।

বাংলাদেশ কীভাবে জঙ্গিবাদের ঝুঁকিতে?

আমাদের দেশের নব্বই ভাগ মানুষ নিজেদেরকে মুসলিম বলে বিশ্বাস করে। তারা আল্লাহ ও রসুলকে ভালোবাসে। জিহাদী চেতনা আমাদের দেশের মানুষেরও আছে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। বিগত দিনগুলোতে ইসলামের নামে এখানেও গড়ে উঠেছে শত শত রাজনৈতিক দল, উপদল, প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে কোনোটা যেমন উদারপন্থী, তেমনি উগ্রপন্থী চেতনায় বিশ্বাসী দল বা সংগঠনও রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় ইস্যুকেন্দ্রিক বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, মিছিলে এবং সরকারবিরোধী রাজনৈতিক কর্মসূচিতেও প্রায়ই মানুষের ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্র চর্চার নামে যুগের পর যুগ ধরে আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে বিভক্তি, হানাহানি ও নৈরাজ্যময় পরিস্থিতি বিরাজ করে আসছে- এই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাও জঙ্গিবাদের উত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখতে পারে।

এসব কারণে বাংলাদেশ বরাবরই জঙ্গিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের একটি ঝুঁকির মধ্যে ছিল। তথাপি একটা সময় পর্যন্ত আমরা জঙ্গিবাদকে কেবল গুটিকতক দেশের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট বা কেবল মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কট মনে করে নিশ্চিন্তে থাকতে পেরেছি। কিন্তু এখন আর সে সুযোগ একেবারেই নেই। ইতোমধ্যে আমরা আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন জঙ্গি আস্তানার আত্মঘাতী হামলাগুলো সারা বিশ্বে বাংলাদেশ সম্পর্কে যে ধারণা পৌঁছে দিচ্ছে তা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য ভয়াবহ অশনিসংকেত। গত কয়েক যুগের ঘটনা পরিক্রমা এই সাক্ষ্যই দেয় যে, কোনো দেশে একবার আত্মঘাতী হামলা আরম্ভ হলে সেই দেশ দ্রুত অস্থিতিশীল পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। হাজারো সামরিক অভিযান চালিয়েও তা রোধ করা আর সম্ভব হয় না।

জঙ্গিবাদ নির্মূলে সরকার কী পদক্ষেপ নিচ্ছে?

জঙ্গিবাদ নির্মূলে আমাদের সরকার দৃশ্যত দুই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তার একটি হচ্ছে আইন ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জঙ্গিদেরকে দুর্বল করে দেওয়া এবং যতদূর সম্ভব নিশ্চিহ্ন করে ফেলা। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আমাদের আইন-

শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বরাবরই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকায় রয়েছে। জঙ্গিবিরোধী অভিযান চালানোর জন্য পুলিশের বিশেষায়িত কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্স ন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট গঠন করা হয়েছে। উপরন্তু বিপদজনক অভিযানগুলোতে সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডো টিমকেও অংশ নিতে দেখা গেছে। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও গত কয়েক বছর ধরে একের পর এক জঙ্গি হামলার মাধ্যমে আমরা এই বার্তাই পাচ্ছি যে শক্তিপ্রয়োগ করে জঙ্গিবাদ নির্মূল করা যাচ্ছে না। তাই এখন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদেরকেই বলতে শোনা যাচ্ছে, শক্তি প্রয়োগ করে বড়জোড় জঙ্গিদেরকে সাময়িকভাবে কোনঠাসা করে রাখা গেলেও পুরোপুরি নির্মূল করে ফেলা সম্ভব নয়।

কেবল শক্তি প্রয়োগ করে জঙ্গিবাদ নির্মূল সম্ভব নয় কেন?

প্রথম কারণ- জঙ্গিবাদ আদর্শিক বিষয়। যারা জঙ্গি হচ্ছে তারা একটি ভ্রান্ত আদর্শকে সঠিক মনে করে সেটা প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এর সঙ্গে তাদের ধর্মীয় আবেগ ও ঈমান জড়িত। তারা যা করছে পার্থিব লাভের আশায় করছে না, পরকালীন প্রতিদানের আশায় করছে, যদিও ভুল পথে গন্তব্যে পৌঁছা যায় না।

এমতাবস্থায় শুধু শক্তি প্রয়োগ করলে একে ঈমানী পরীক্ষা মনে করায় তাদের ঈমান আরো বলিষ্ঠ হচ্ছে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সেই চেতনা প্রবাহিত হচ্ছে। এই ধর্মীয় চেতনাকে অবজ্ঞা করে এতদিন অনেকেই জঙ্গিবাদের উৎপত্তির কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন অশিক্ষা, বেকারত্ব, দারিদ্র্য ইত্যাদির কারণে অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে তারা জঙ্গিবাদের দিকে পা বাড়াচ্ছে। কিন্তু সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলাগুলোতে ইংলিশ মিডিয়াম ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া প্রভাবশালী বিত্তবান ঘরের সন্তানেরা অংশ নেওয়ায় এখন অনেকেই বুঝতে পারছেন জঙ্গিরা কোনো পার্থিব স্বার্থের জন্য ওই পথে যায় না। প্রকৃতপক্ষে জঙ্গিবাদের সাথে মানুষের ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট জড়িত এবং এই সেন্টিমেন্ট এতটাই শক্তিশালী যে জেল-ফাঁসির ভয় করা তো দূরের কথা, জঙ্গিরা এই পথে মৃত্যুবরণ করতে পারাকেই বিরাট সৌভাগ্য মনে করে। তাই জাতিসংঘের মহাপরিচালক বান কি মুনকে বলতে শুনি, 'জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থায় জঙ্গিবাদ আরো বেড়েছে'। আমাদের প্রধানমন্ত্রীও জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নোত্তরে বলেন, 'কেবল অস্ত্র দিয়ে জঙ্গিবাদ দমন সম্ভব নয়' (প্রথম আলো, ৫ অক্টোবর ২০১৬)।

দ্বিতীয় কারণ- জঙ্গিবাদের স্রষ্টা প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলো যে কথা পূর্বেই বলে এসেছি। তারা জঙ্গিবাদের ইস্যুকে জিঁইয়ে রেখে বিশ্বময় নিজেদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এজন্য মানবতার যতই বিপর্যয় ঘটুক না কেন, সেটা এই দানবিক পরাশক্তিগুলোর জন্য কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। তাদের চাই তেল, গ্যাস, আধিপত্য, অস্ত্রব্যবসার জমজমাট বাজার এবং শক্তিশালী প্রভাব বলয় (Predominance)। এই পরাশক্তিগুলোকে অনুসরণ করে যদি শুধুমাত্র বল প্রয়োগে জঙ্গিবাদ দমনের বা নির্মূলের চেষ্টা চালানো হয়, সেটা কাঙ্ক্ষিত ফল বয়ে আনবে না।

আদর্শিক লড়াইয়ের বিকল্প নেই

এখন আমাদের নিজেদের স্বার্থে জঙ্গিবাদকে কার্যকর পদ্ধতি দ্বারা মোকাবেলা করা উচিত। আর সেটা হলো- সঠিক আদর্শ দিয়ে ভ্রান্ত আদর্শ জঙ্গিবাদকে মোকাবেলা করতে হবে। যারা জঙ্গিবাদের পক্ষে প্রচার প্রচারণা চালায়, তারা কোর'আন হাদিস, ইতিহাস ইত্যাদি থেকে নানা যুক্তি, তত্ত্ব ও তথ্য তুলে ধরে মানুষকে জঙ্গি হতে প্ররোচিত করে। তাদের সেই যুক্তিগুলোকে যদি ভ্রান্ত হিসাবে প্রমাণ করা যায় তাহলে অবশ্যই কেউ আর জঙ্গিবাদের দিকে যাবে না এবং ইতোমধ্যেই যারা সে পথে পা বাড়িয়েছে তারাও যদি বুঝতে পারে যে এ পথ তাদের দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই ধ্বংস করছে তাহলে তারাও সংশোধিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কথা এখন অনেকেই বলছেন, জঙ্গিবাদ একটি আদর্শ তাই একে মোকাবেলা করতে পাল্টা আদর্শ (Counter Narratives) লাগবে এবং সেটা সেক্যুলার আদর্শ দিয়ে হবে না, ধর্মীয় আদর্শ হতে হবে। আমাদের দেশের সাবেক বিডিআর প্রধান মেজর জেনারেল (অব.) আ.ল.ম ফজলুর রহমানও জঙ্গিবাদ মোকাবেলা সম্পর্কে এই একই যুক্তি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, "রাজনীতিকে যেমন রাজনীতি দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে, ইসলামের মধ্যে যারা জঙ্গিবাদ নিয়ে আসছে তাদেরকে কোর'আন-হাদিস দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। সেক্যুলারিজম দিয়ে মোকাবেলা করে আপনি পারবেন না। কারণ তারা সেক্যুলারিজমকে একটি চ্যালেঞ্জিং পার্টি মনে করে অর্থাৎ হয় তারা জিতবে আপনি হারবেন অথবা আপনি হারবেন তারা জিতবে। এভাবে এটাকে আপনি মোকাবেলা করতে পারবেন না।" (চ্যানেল আই-তৃতীয় মাত্রা, ১৯ অক্টোবর ২০১৫)। একইভাবে কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্স ন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম বলেন, ''জঙ্গিরা বা সন্ত্রাসবাদীরা যেহেতু ডগমা বেইজড বা আইডিওলজি বেজড, তো এটাকে মোকাবেলা করতে গেলে ট্যাক্টিক্যালি শুধু গ্রেফতার কিংবা জেলে ভরে সাজা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই একে মোকাবেলা করা কঠিন। একটা স্ট্র্যাটেজি থাকা দরকার, যে স্ট্র্যাটেজির কমপোনেন্ট থাকবে একটা কাউন্টার র‍্যাডিকেলাইজেশন, যেটা প্রিভেনশনের কাজ করবে যেন নতুন করে র‍্যাডিকেলাইজড না হতে পারে, বা যারা ইতোমধ্যেই র‍্যাডিকেলাইজড হয়েছে কিন্তু সরাসরি টেরোরিস্ট অ্যাক্টিভিটিস এ অংশগ্রহণ করে নি, তাদেরকে ফিরিয়ে আনা। **সেটা কাউন্টার ন্যারেটিভস প্রদানের মাধ্যমে তাদের ন্যারেটিভটাকে মোকাবেলা করে ফিরিয়ে আনার কাজ,** যেটা আসলে সরাসরি ল' অ্যান্ড ইনফোর্সমেন্টের কাজ নয়।'' (২২ জানুয়ারি, ২০১৭, টকশো- 'মুখোমুখী', চ্যানেল ২৪)

এমতাবস্থায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ কতটা ফলপ্রসূ হচ্ছে?

কঠোর আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ, সামরিক অ্যাকশন, গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি পদ্ধতিতে জঙ্গিবাদ নির্মূলের যে চেষ্টা সরকার চালাচ্ছে তার প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু জঙ্গিবাদের কাউন্টার ন্যারেটিভ হিসেবে যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া হচ্ছে সেগুলো নিয়ে ভাবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। যেমন জঙ্গিদেরকে

ডিমোটিভেশন বা ডিমোরালাইজেশন করার জন্য বিভিন্ন ইমাম, খতিব ও আলেম ওলামাদেরকে দিয়ে মসজিদ-মাদ্রাসায় জঙ্গিবাদবিরোধী খুৎবা ও ফতোয়া প্রদান করানো হচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিশাল এক 'আলেম সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হলো যার মূল প্রতিপাদ্য ছিল এই 'জঙ্গিবাদ'। এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে জেলায় জেলায় আলেমদেরকে জঙ্গিবাদবিরোধী বক্তব্য প্রদানে উৎসাহিত করে বিভিন্ন সভা-সমাবেশ আয়োজন করা হচ্ছে। কিন্তু প্রাকৃতিক একটি সত্য হচ্ছে অন্যায়ের প্রতিকার কখনও অন্যায় দিয়ে হয় না। যেহেতু জঙ্গিবাদ একটি অন্যায়, বেআইনী কর্মকাণ্ড, কাজেই যারা এই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ইসলামের প্রকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে কাজ করবেন তাদেরকে দু'টি শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

প্রথমত, তাদের নিজেদেরকে ন্যায়ের উপর দণ্ডায়মান হতে হবে অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের ধারক হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, তারা ধর্মের কাজ করে কোনো ব্যক্তিস্বার্থ, গোষ্ঠীস্বার্থ বা কোনো প্রকার বৈষয়িক স্বার্থই হাসিল করতে পারবে না। এই কাজে এগিয়ে আসতে হবে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে কেবলই আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে।

- *গত ১১ মার্চ ২০১৭ তারিখে রাজধানীর থাই চি রেস্টুরেন্ট এন্ড ক্যাফেতে হেযবুত তওহীদের উদ্যোগ দেশের গণমাধ্যমের বিশিষ্টজনদের নিয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আদর্শিক লড়াইয়ের প্রস্তাবনা তুলে ধরেন হেযবুত তওহীদের এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম।*

নিঃস্বার্থ হতে হবে কারণ যাদের ওয়াজ-নসিহতের সাথে স্বার্থের মিশ্রণ থাকে তাদের ওয়াজ-নসিহতের কোনো প্রভাব মানুষের আত্মায় পড়ে না অর্থাৎ কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন আসে না- এটা প্রাকৃতিক নিয়ম। এ কারণেই পবিত্র কোর'আনে ধর্মের কাজ করে বিনিময় গ্রহণ করাকে পথভ্রষ্টতা ও জাহান্নামের কারণ বলা হয়েছে। সুতরাং জঙ্গিবাদের কাউন্টার ন্যারেটিভ হিসেবে সরকারি পদক্ষেপগুলোকে ফলপ্রসূ করতে হলে এমন নিঃস্বার্থ, আত্মত্যাগী ও দেশপ্রেমিক মানুষ দরকার, যারা হবেন ন্যায়ের উপর দণ্ডায়মান ও প্রকৃত ইসলামের ধারক। প্রশ্ন হচ্ছে, আজকে যে

আলেম-ওলামা, ইমাম-খতিবদের দিয়ে জঙ্গিবাদকে ইসলামবিরোধী বলে ফতোয়া দেওয়ানো হচ্ছে তারা কি নিজেরা ন্যায়ের উপর দণ্ডায়মান আছেন? তারা কি ধর্মের কাজ করে কোনো প্রকার বৈষয়িক স্বার্থ নিচ্ছেন না?

এটা অলীক কল্পনাভিন্ন কিছু নয় যে, কেউ একজন জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিলেই সেটা মানুষ একবাক্যে মেনে নিবে। কখনই তা হবে না। সেই ব্যক্তি কে, তার উদ্দেশ্য কী, তার কোনো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ আছে কিনা, তার বক্তব্য বর্তমান পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, যৌক্তিক কিনা সেটাও ভেবে দেখা হবে। তাছাড়া বিশ্বময় মুসলিম জাতির উপর যে অবর্ণনীয় দুর্দশা নেমে এসেছে তা থেকে পরিত্রাণের সুনির্দিষ্ট তাগিদও তার বক্তব্যে থাকতে হবে। জনগণ যদি দেখে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে এত কথা, এত লেখা, এত সভা-সমাবেশ, প্রচার-প্রচারণার উদ্দেশ্য কেবলই এক বা একাধিক মহলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিল করা তাহলে সেই ফতোয়া, খুৎবা ও ওয়াজ-নসিহতে জনগণ বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত হবে না। কারণ এটা যে বক-ধার্মিকতা তা বোঝার মতো মানসিক পরিপক্কতা সবারই আছে। আজকে আমরা যদি জঙ্গিবাদকবলিত অন্যান্য দেশগুলোর দিকে তাকাই তাহলে দেখব সেখানে যাদেরকে দিয়ে সরকারগুলো কাউন্টার ন্যারেটিভের চেষ্টা করেছে তারা 'নিঃস্বার্থ' ছিল না, তাই তাদের প্রচেষ্টা শেষাবধি জাতিকে রক্ষা করতে পারে নি, সামান্য ধাক্কাতেই বালির বাঁধের মতো ধসে পড়েছে সমগ্র দেশ।

তাহলে এখন কী করণীয়?

সরকার, রাজনৈতিক দল, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, আলেম-ওলামা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সবাইকে এক টেবিলে বসে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমাদের এখন কী করণীয়। এ ক্ষেত্রে কে কোন দলের, কে কোন মতের, কে কোন আদর্শের তা দেখা চলবে না। সবার মতামত ও পরামর্শ শুনতে হবে, তারপর বিবেচনা করতে হবে সেটা যৌক্তিক কিনা। জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য কথা যেই বলুক নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করতে হবে।

আমাদেরকে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে হবে, কোনটা প্রকৃত ইসলাম আর কোনটা বিকৃত ইসলাম, কোনটা হক্ব কোনটা বাতিল। আজকে পৃথিবীময় ইসলামের নামে হাজারো মত-পথ চালু করে দেওয়া হয়েছে। কেউ ইসলামের নামে ধান্দাবাজির রাজনীতি করছে, কেউ অর্থোপার্জন করছে, কেউ সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। আবার ইসলামের নামেই একদল মানুষ দুনিয়াবিমুখ হয়ে হুজরা-খানকায় আধ্যাত্মিক সাধনা করছে। একেক ফেরকা-মাজহাবের কাছে ইসলাম এখন একেক রকম। ইসলামের কোনো সুনির্দিষ্ট রূপরেখা কোথাও নেই। কিন্তু ইতিহাস বলে, আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত ইসলাম এমন ছিল না। সেই ইসলাম সবার কাছেই এক রকম ছিল। কোনো ফেরকা-মাজহাব ছিল না, এত মত-পথের বালাই ছিল না, যে কোনো প্রশ্নে জাতি থাকত ঐক্যবদ্ধ। প্রশ্ন হচ্ছে, যে ইসলাম আরবদেরকে ইস্পাতকঠিন ঐক্যবদ্ধ করল সেই ইসলামের নামেই আমাদের সমাজ এতখানি বিভক্ত হয়ে পড়ল কীভাবে?

বস্তুত আল্লাহ কেন রসুলকে পাঠালেন, ইসলামের উদ্দেশ্য কী, রসুলাল্লাহ (সা.) কী লক্ষ্যে সংগ্রাম করলেন, কীসের ভিত্তিতে মুসলিম জাতিটি গঠিত হলো, তারপর ইতিহাসের কোন জায়গাটিতে এই জাতি পথ হারাল, কোন অপরাধে আল্লাহ এদেরকে অন্য জাতির গোলাম বানালেন- এই ইতিহাসের নির্মোহ বিশ্লেষণ না করা পর্যন্ত উপরোক্ত প্রশ্নের সঠিক জবাব আমরা পাব না। তাই বক্ষমান পুস্তিকায় আমরা অতি সংক্ষেপে সেই ইতিহাস আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

ইসলামের উদ্দেশ্য কী?

একদিন শেষ রসুল মোহাম্মদ (স.) কা'বা শরীফের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তখন সময়টা ছিল এমন যখন তিনি ও তাঁর সাহাবীগণের ওপর প্রচণ্ড বাধা এবং অবর্ণনীয় নির্যাতন নিপীড়ন চলছিল। হঠাৎ একজন সাহাবা বললেন, হে আল্লাহর রসুল! এই অত্যাচার নিপীড়ন আর সহ্য হচ্ছে না। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আমাদের বিরোধীরা সব যেন ধ্বংস হয়ে যায়। কথাটাকে আল্লাহর রসুল কতখানি গুরুত্ব দিলেন তা বোঝা যায় এই থেকে যে, তিনি হেলান ছেড়ে সোজা হয়ে বসলেন এবং ঐ সাহাবাকে বললেন, তুমি কী বললে? সাহাবা তার কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। শুনে আল্লাহর রসুল তাকে বললেন, 'শোন, শীঘ্রই সময় আসছে যখন কোনো যুবতী মেয়ে গায়ে গহনা পরে একা সা'না থেকে হাদরামাউদ যাবে। তার মনে এক আল্লাহ এবং বন্য জন্তু ছাড়া আর কোনো ভয় থাকবে না।' [খাব্বাব (রা.) থেকে বোখারী ও মেশকাত]।

এই ঘটনাটির মধ্যে কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। প্রথমত, আল্লাহর রসুল উদাহরণস্বরূপ বললেন, স্ত্রী লোক, কোনো পুরুষের কথা বললেন না। কারণ স্ত্রী লোকের প্রাণ ও সম্পদ ছাড়াও আরও একটি জিনিস হারানোর সম্ভাবনা আছে যা পুরুষের নেই। সেটা হলো ইজ্জত, সতীত্ব, সম্ভ্রম। দ্বিতীয়ত, ঐ স্ত্রী লোক বয়সে যুবতী। অর্থাৎ লোভাতুরদের কাছে আরও লোভনীয়। তৃতীয়ত, অলঙ্কার গহনা পরিহিত, চোর ডাকাতের জন্যও লোভনীয়। এতগুলো লোভনীয় বিষয় থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর রসুল বলছেন, অনুরূপ একটি অলঙ্কার পরিহিত যুবতী স্ত্রীলোক একা সা'না শহর থেকে প্রায় তিনশ' মাইল দূরবর্তী হাদরামাউতে যেতে পারবে, যা অন্তত কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার, এত দীর্ঘ পথে আল্লাহ এবং বন্য জন্তু ছাড়া কোনো ভয় করবে না। চতুর্থত, লক্ষ করার বিষয়, স্ত্রীলোকটি শুধু পথের নিরাপত্তা সম্বন্ধেই নিশ্চিন্ত হবে না, বরং বন্য জন্তু ছাড়া অন্য কোনো রকম বিপদের কোনো আশঙ্কাই তার থাকবে না। কোন্ সময়ে তিনি উক্ত কথা বলছেন? যখন কিনা মেয়ে শিশুদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো।

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহর রসুল কিন্তু বললেন না শিগগিরই এমন সময় আসবে পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ হবে, লোকে দলে দলে নামাজ পড়তে যাবে, সবাই রোজা রাখবে, জিকির করবে, ঘরে ঘরে কোর'আন তেলাওয়াত হবে ইত্যাদি। এসব বললেন না, বরং নির্দিষ্টভাবে একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝালেন নিরাপত্তার কথা। এ থেকে আমরা ইসলামের ও আল্লাহর রসুলের ইতিহাস সৃষ্টিকারী সংগ্রামী জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্যটি বুঝতে পারি, তা হচ্ছে- সমাজ থেকে যাবতীয় ভয় ভীতি,

আতঙ্ক দূর করে মানবজীবনে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। চিন্তা করে দেখুন, একটি সমাজের নিরাপত্তা কোন্ পর্যায়ে গেলে অনুরূপ অবস্থায় একটি স্ত্রীলোকের মনে আল্লাহ এবং বন্য পশু ছাড়া আর কোনো ভয়ই থাকে না। ইতিহাস সাক্ষী, রসুলের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়নি। বাস্তবেই তেমন একটি শান্তিময়, নিরাপদ সমাজ ও নিশ্চিত জীবন উপহার দিয়েছিলেন তারা।

- *গত ৩১ মার্চ ২০১৭ তারিখে রাজধানীর আজমপুরে হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী এক জনসভার আয়োজন করা হয়। জনসভায় উপস্থিত ছিলেন রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কয়েক হাজার জনতা।*

প্রকৃত ইসলাম কেমন ছিল?

আজ থেকে ১৪শ' বছর আগে সমগ্র মানবজাতির জীবনে এমন একটা সময় চলমান ছিল যখন মানুষ অন্যায় অবিচার, হানাহানি, যুদ্ধ, রক্তপাত ইত্যাদিতে পরিপূর্ণভাবে নিমজ্জিত ছিল। সেই ক্ষণে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে শান্তি দেওয়ার জন্য আসলেন আখেরি নবী মোহাম্মদ (সা.)। তিনি এসে মানুষকে স্রেফ একটা কথায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান করলেন যে তোমরা বল- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম মানবো না। এতেই তোমাদের মুক্তি, এতেই জান্নাত। প্রথম প্রথম তিনি প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হলেন, তবুও তিনি এই তওহীদের আহ্বান সকল গোত্রের কাছে পৌঁছাতে লাগলেন। অবশেষে একটি জনগোষ্ঠী এ কথার উপর ঐক্যবদ্ধ হলো যে তারা আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম মানবে না এবং রসুলাল্লাহকে তাদের নেতা হিসাবে মান্য করবে। তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের জীবনের নানাবিধ সমস্যা ও জটিলতাগুলোর ফায়সালা দেওয়ার ভার তাঁর উপরই বর্তালো। আর আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে রসুলাল্লাহকে তার সমাধান অবগত করতে লাগলেন। আল্লাহ পর্যায়ক্রমে মুসলিম জাতিকে তাদের ব্যক্তিগত থেকে

রাষ্ট্রীয় জীবনের সমস্যাদি যথা বিয়ে, তালাক, বিচার, দণ্ড, যুদ্ধ, সন্ধি, চুক্তি, ব্যবসা, বাণিজ্য সব বিষয়ে এবং সেই জাতির শারীরিক মানসিক আত্মিক প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা বা আমলের হুকুম নাজিল করলেন। এভাবে ২৩ বছর ধরে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের উপর ঐক্যবদ্ধ একটা জাতির প্রতি প্রয়োজন সাপেক্ষে একে একে যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, ভর্ৎসনা ইত্যাদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে সেগুলোর সংকলিত রূপই হচ্ছে পবিত্র কোর'আন। আর আল্লাহর কোন হুকুম কীভাবে পালিত হবে, কার বেলায় কতটুকু প্রযোজ্য হবে, কোন সাহাবী কি কথা বলেছেন, রাসুল কি কথা বলেছেন, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদির যে চর্চা রসুল ও তাঁর জাতি করেছেন সেগুলোই পরবর্তীতে হাদীস হিসাবে সংকলিত হয়েছে। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, জাতি গঠিত হবার পর ও সেই জাতির নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করার পর বিশ্বনবী কিন্তু কেবল একজন নবীই থাকলেন না, তিনি হলেন একাধারে রাষ্ট্রনায়ক, সেনাবাহিনীর প্রধান, বিচারক। তাঁকে অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে। অনেক যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়েছে একজন সেনাপ্রধান হিসেবে। অনেক অপরাধীকে দণ্ড প্রদান করতে হয়েছে একজন বিচারক হিসেবে। এই সহজ সত্যটি বুঝতে না পারায় বর্তমানে একদল লোক জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে, আরেকদল ইসলামবিদ্বেষী হয়ে রসুলের পবিত্র জীবনীকে অবমাননা করছে।

এর পরবর্তী ইতিহাস হচ্ছে, নিরাপত্তা, আত্মিক পরিশুদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতির চরম শেখরে পৌঁছে গেল তৎকালীন মুসলিম জাতিটি। তাদের সমাজে এমন নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে মানুষ রাতে ঘুমানোর সময় ঘরের দরজা বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করত না, রাস্তায় ধনসম্পদ ফেলে রাখলেও তা পরে যেয়ে যথাস্থানে পাওয়া যেত, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, রাহাজানি প্রায় নির্মূল হয়ে গিয়েছিল, আদালতে মাসের পর মাস কোন অপরাধ সংক্রান্ত মামলা আসতো না। কেউ অপরাধ করে ফেললেও নিজেই নিজের বিচার দাবি করত। আর অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিটি মানুষ এমন স্বচ্ছল হয়েছিল যে, তারা যাকাত ও সদকা দেওয়ার জন্য টাকা পয়সা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো কিন্তু সেই টাকা গ্রহণ করার মত লোক পাওয়া যেত না। শহরে নগরে লোক না পেয়ে মানুষ মরুভূমির অভ্যন্তরে যাকাত দেওয়ার জন্য ঘুরে বেড়াতো।

কিছুদিন পূর্বেও যারা বংশপরম্পরায় বিবাদে লিপ্ত থাকত, আইয়্যামে জাহেলিয়াতের সেই বর্বর আরব জাতিকে ইসলাম ঐক্যবদ্ধ করে দিল, শত্রুকে ভাই বানিয়ে দিল, স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক মানুষদেরকে মানবতার কল্যাণে জীবন–সম্পদ উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সংগ্রামী মানুষে রূপান্তরিত করল। জ্ঞান-বিজ্ঞানে যারা ছিল সবচেয়ে পশ্চাদপদ, সেই জাতিটিই ইসলামের পরশপাথরে এতখানি পরিবর্তিত হয়ে গেল যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষকের আসন লাভ করল। সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় অভিনব অগ্রগতি সাধন করে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সেই জাতিটি পৃথিবীর ইতিহাসের অবিস্মরণীয় এক রেনেসাঁর জন্ম দিল। ইসলামের সেই রেনেসাঁই পরবর্তীতে স্পেন ও ফ্রান্স হয়ে ইউরোপীয় রেনেসাঁর উপাদান যুগিয়েছিল এ কথা পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকরাই স্বীকার করছেন এখন।

বিকৃতি সাধনের ইতিহাসঃ

কিন্তু এরই মাঝে ঘটে যায় এক মহাদুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আল্লাহর রসুলের ইহলোক ত্যাগের ৬০-৭০ বছর পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীতে মানবাধিকার, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার পর জাতি হঠাৎ তাদের লক্ষ্য অর্থাৎ তাদের উপর রসুলাল্লাহর (সা.) অর্পিত দায়িত্বের কথা ভুলে গেল। তারা পৃথিবীর অপরাপর রাজা-বাদশাহর মতো ভোগ বিলাসের সঙ্গে রাজত্ব করতে লাগল।

জাতিটিকে যে উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল সেটাই যখন তারা ভুলে গেল তখন আর তাদের অস্তিত্বের কোনো অর্থ থাকল না। তাদের একটি বড় অংশ, আলেম, পণ্ডিত শ্রেণি তাদের ক্ষুরধার মেধা খাটিয়ে দীনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে লক্ষ লক্ষ মাসলা মাসায়েল রচনা করতে লাগল। ছোটখাটো বিষয়গুলো নিয়ে ফতোয়া, পাল্টা ফতোয়া দিতে দিতে হাজার রকমের ফতোয়ার ধারা উপধারার পাহাড় গড়ে উঠল। আর তার উপর ভিত্তি করে তর্ক-বাহাস করে এক উম্মতে মোহাম্মদী হাজারো ফেরকা আর মাজহাবে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেল।

অন্যদিকে জাতির মধ্যে জন্ম নিল একটি বিকৃত সুফিবাদী গোষ্ঠী। তারা উম্মতে মোহাম্মদীর সংগ্রামী জীবনটাকে উল্টিয়ে একেবারে অন্তর্মুখী করে দিল। যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী, প্রতিবাদী দুর্দান্ত গতিশীল ইসলামকে তারা সংসারত্যাগী, বৈরাগী, সাধু-সন্ন্যাসীর ধর্মে পরিণত করল। সমাজে নিরাপত্তা, ন্যায় প্রতিষ্ঠিত আছে কিনা সে বিষয়ে উদাসীন হয়ে তারা নিজেদের আত্মার উন্নতিকেই জীবনের মূল কাজ বানিয়ে নিল। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপায় নির্দেশ করতে গিয়ে এই আধ্যাত্মিক সাধকগণ শত শত তরিকা সৃষ্টি করলেন। আর বিরাট সংখ্যক সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষ হাজারো মতভেদের উপর গড়ে ওঠা ফেরকা-মাজহাব-তরিকায় বিভক্ত হয়ে গেল।

সময় যত গড়িয়েছে জাতি সংখ্যায় বেড়ে কোটি কোটি হয়েছে। কিন্তু কর্মফল হিসেবে জাতি তখন শিয়া, সুন্নী, শাফেয়ী, হাম্বলী, হানাফী, চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশবন্দিয়া ইত্যাদি মাজহাবে তরিকায় বিভক্ত। ঐক্যবদ্ধ হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া বাদ দিয়ে তারা নিজেরা একে অপরকে দোষারোপ, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মারামারি, হানাহানি করতে লাগল। কী দুর্ভাগ্যজনক! উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক যে ক্বাবা, সেই ক্বাবায় গিয়েও প্রধান চার মাজহাবের অনুসারীরা একত্রে সালাহ (নামাজ) করতে পারেনি বহু বছর। অপর মাজহাবের প্রতি ঘৃণা আর নিজ মাজহাবের অহংকারকে ভিত্তি করে তারা ক্বাবার চার কোণে চারটি মেহরাবসহ তাবু স্থাপন করে নিজ নিজ মাজহাবের ইমামের পেছনে নামাজ পড়েছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী। কী নির্মম ইতিহাস!

আল্লাহ কোর'আনে বারবার সতর্কবাণী করেছেন 'শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ত্যাগ করলে মর্মন্তুদ শাস্তি দেওয়া হবে', আল্লাহর রসুল বলেছেন 'যারা আমার সুন্নাহ ছেড়ে দিবে তারা আমার কেউ নয় আমি তাদের কেউ নই' 'তোমরা ঐক্য নষ্ট কর না, ঐক্য ভঙ্গ কুফর'। সেই সতর্কবাণীগুলো ভুলে গিয়ে যখন জাতি তর্ক-বাহাস আর ফতোবাজিতে মেতে উঠল, তখন আল্লাহ এদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি

দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বর্বর হালাকু খানের সৈন্যরা। মুসলমানদের রক্তে ফোরাত নদী লাল হলো। তাদের মস্তক দিয়ে হালাকু খান পিরামিড বানালো। নারী-শিশুদেরকে পর্যন্ত রেহাই দেওয়া হলো না। স্বয়ং খলিফাকে লাঞ্ছনা আর অপমানের সাথে হত্যা করা হলো। তবু জাতির হুঁশ হলো না। তারা আবার ফিরে গেল সেই হুজরা, খানকায়। সেই বাহাস, তর্কাতর্কি, চুলচেরা বিশ্লেষণ, আধ্যাত্মিক ঘষামাজাই শুরু হলো নতুন উদ্যোমে। আবার শুরু হলো শাসকদের ভোগ-বিলাসিতার রাজত্ব। ফলে এবার এল চূড়ান্ত মার খাবার পালা।

জাতির অনৈক্য ও উদ্দেশ্যচ্যুতির ফলস্বরূপ আল্লাহর শাস্তি হিসাবে এই জাতি ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোর কাছে সামরিকভাবে পরাজিত হয়ে গোলামে পরিণত হলো। শুরু হলো ঔপনিবেশিক যুগ, দাসত্বের যুগ। এই সময় মুসলিমদের সমষ্টিগত জীবনে দুইটি বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটল। প্রথমত, জাতীয় জীবন থেকে ইসলাম অপসৃত হলো, দ্বিতীয়ত ব্রিটিশরা তাদের সুবিধামত একটি ইসলাম তৈরি করে এই জাতিকে শিক্ষা দিতে লাগল।

ব্রিটিশ প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় দাসত্বের দুই বিষবৃক্ষঃ

আমাদেরকে পদানত করার পর চিরকালের জন্য গোলাম বানিয়ে রাখতে ব্রিটিশরা একটি চক্রান্ত করল। তারা দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করল- একটি সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা, আরেকটি মাদ্রাসা শিক্ষা। এই দুটো শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে চিন্তা-চেতনায় মৌলিক ব্যবধান ও বৈপরীত্য রয়েছে। এখানেই তারা আমাদের জাতিটিকে মানসিকভাবে ও বাস্তবে বিভক্ত করে দিয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য কী ছিল তা আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন অধ্যক্ষ ইয়াকুব শরীফ "আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস" বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, "মুসলমানরা ছিল বীরের জাতি, ইংরেজ বেনিয়ারা ছলে-বলে-কৌশলে তাদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাদের প্রচলিত ধর্ম, শিক্ষা ও মর্যাদা হরণ করার জন্য পদে পদে যেসব ষড়যন্ত্র আরোপ করেছিল, আলিয়া মাদ্রাসা তারই একটি ফসল। বাহ্যত এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন করা হয়েছিল আলাদা জাতি হিসাবে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্তে, যাতে মুসলমানদের ধর্ম, কৃষ্টি ও আদর্শ রক্ষা পায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়াই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য।" এই যে ধোঁকাটা দিল, কী সে ধোঁকা? মারটা কোন জায়গায় দিল সেটা বুঝতে হবে। এখন ফলাফল দেখেই বোঝা যাচ্ছে আমরা কোথায় ধোঁকাটা খেয়েছি।

ব্রিটিশ পণ্ডিতরা অনেক গবেষণা করে একটি বিকৃত ইসলাম তৈরি করল যা থেকে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের চেতনাকে (জেহাদ) বাদ দেওয়া হলো এবং ব্যক্তিগত জীবনের মাসলা-মাসায়েল, ফতোয়া, দোয়া-কালাম, মিলাদের উর্দু-ফার্সি পদ্য, বিশেষ করে দীনের যে বিষয়গুলো সম্পর্কে পূর্ব থেকেই বিভিন্ন মাজহাবের ফকীহদের মধ্যে বহু মতবিরোধ সঞ্চিত ছিল সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করল অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিল যেন সেগুলো নিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষিতরা তর্ক, বাহাস, মারামারিতে লিপ্ত থাকে। সেই ইসলামটিকে জাতির মনে-

মগজে গেড়ে দেওয়ার জন্য বড়লাট লর্ড ওয়ারেন হেসটিংস ১৭৮০ সনে ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কোলকাতায় আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করল। সেখানে নিজেরা অধ্যক্ষ থেকে পর পর ২৬ জন খ্রিষ্টান (প্রথম খ্রিষ্টান অধ্যক্ষ এ.এইচ. স্প্রেঙ্গার এম.এ. এবং শেষ খ্রিষ্টান অধ্যক্ষ এ. এইচ. হার্টি এম.এ.) ১৯২৭ সন পর্যন্ত ১৪৬ বছর ধরে মুসলিম জাতিকে সেই বিকৃত ইসলামটি শেখাল। [দেখুন- আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, মূল- আঃ সাত্তার, অনুবাদ- মোস্তফা হারুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এবং Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal by Dr. Sekander Ali Ibrahimy (Islami Foundation Bangladesh)]।

মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাসে গণিত, ভূগোল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদির কোনো কিছুই রাখা হলো না। ফলে আলেমরা বাস্তব জীবনে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিমজ্জিত হলেন। কিন্তু জীবিকা ছাড়া তো মানুষ চলতে পারে না। অগত্যা তারা ধর্মের বিভিন্ন কাজ করে রুজি-রোজগার করাকেই নিয়তি হিসাবে গ্রহণ করলেন। ব্রিটিশরা এটা এই উদ্দেশ্যে করল যেন তারা সর্বদা পরনির্ভরশীল হয়ে থাকে এবং মেরুদণ্ড সোজা করে কখনো তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারে। ইংরেজরা তাদের এ পরিকল্পনায় শতভাগ সাফল্য লাভ করল। সেখান থেকে কোর'আন-হাদীসের জ্ঞান নিয়ে লক্ষ লক্ষ আলেম বেরিয়ে আসছেন কিন্তু তাদেরকে জাতির ঐক্য গঠনের গুরুত্ব, জীবন-সম্পদ উৎসর্গ করে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রেরণা, সমাজে বিরাজমান অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়নি। এই ষড়যন্ত্রের পরিণামে তাদের মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞানের অহঙ্কার যেমন সৃষ্টি হলো, পাশাপাশি তাদের হৃদয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গতিশীল ভুবন থেকে পিছিয়ে থাকার দরুন একপ্রকার হীনম্মন্যতাও সৃষ্টি হলো। তাদের অন্তর্মুখিতা, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে গোঁড়ামি, বিভক্তি, নিস্পৃহতা, স্বার্থপরতা, ইসলামের নামে অন্ধত্ব, অযৌক্তিক, কুসংস্কার ও অন্য ধর্মের অনুসারীদের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষের মূল কারণ এই শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াতেই প্রোথিত রয়েছে। শত শত বছর আগের সামাজিক পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান ঐ সময়ের আলেমরা কীভাবে করেছিলেন সেটা তাদের লেখা ফতোয়ার বইগুলোতে ঠাঁই পেয়েছে। বর্তমানের আমূল পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন হাজারো সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু কিতাবি ইসলাম আটকে গেছে সেই পুরানো ফতোয়ার বইতে। এখন যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চাইবেন, তারা নিজেদের সুবিধার জন্য ঘড়ির কাটাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে সেই হাজার বছর আগের সমাজটি আগে প্রতিষ্ঠা করতে চান। মাদ্রাসাগুলোর সিলেবাসে সেই আদ্দিকালের চর্বিত চর্বনেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সময়ের সমাজে যে বাস্তব সমস্যাগুলো বিরাজ করছে সেগুলোর বাস্তব কোনো সমাধান সেখানে নেই।

আলীয়া আর কওমী ধারার মধ্যে পার্থক্য এটুকুই যে, একটি সরকারি অর্থায়নে চলে আরেকটি জনগণের দানের টাকায় চলে, একটি কম গোঁড়া, আরেকটি বেশি গোঁড়া- এই যা। সঠিক শিক্ষা না পেলেও ধর্মীয় চেতনা ঠিকই রয়ে গেছে। বর্তমানে মানবজাতির জীবনে ব্রিটিশদের চাপিয়ে দেওয়া জীবনব্যবস্থার ত্রুটির

দরুন যে হাজারো বাস্তব সমস্যার প্রাদুর্ভাব হয়েছে সেগুলোর সমাধান ঐ মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় যুগোপযোগী, বিজ্ঞানভিত্তিক, যৌক্তিকভাবে উল্লেখিত না থাকায় একটি আদর্শিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠী ইসলামিক রাজনীতির নামে, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জেহাদের নামে মাদ্রাসা ছাত্রদের ঈমানী চেতনাকে নিজেদের মতবাদের অনুকূলে টেনে নিচ্ছে। কেউ অপরাজনীতিতে তাদের ব্যবহার করছে কেউ জঙ্গিবাদে কাজে লাগাচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সে কিন্তু ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাটি পেল না। এই শূন্যতাটাই কাজে লাগাচ্ছে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলো। এখানেই মাদ্রাসা শিক্ষার সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।

অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় (General Education System) দীন সম্পর্কে প্রায় কিছুই শিক্ষা দেওয়া হয়নি। বরং সুদভিত্তিক অংক, ব্রিটিশ রাজা-রানির ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত, পাশ্চাত্যের ধর্মহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা, পাশ্চাত্য বস্তুবাদী দর্শন ইত্যাদি শিক্ষার পাশাপাশি ধর্ম সম্পর্কে, বিশেষ করে ইসলাম সম্পর্কে একটা বিদ্বেষভাব (A hostile attitude) শিক্ষার্থীদের মনে প্রবেশ করানো হলো। ওখান থেকে লক্ষ লক্ষ কথিত আধুনিক শিক্ষিত লোক বের হচ্ছেন যাদের অধিকাংশই চরম আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর। নিজেদের বৈষয়িক উন্নতি ছাড়া আর কিছুই তারা ভাবেন না। তাদের বিরাট একটা সংখ্যা ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মকে মনে করেন সেকেলে, মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা, কল্পকাহিনী। তাদের দৃষ্টিতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে ধর্ম অচল। তাদেরকে শেখানো হলো আধুনিক সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পশ্চিমাদের উদ্ভাবন। কিন্তু এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তি যে মুসলিমরাই নির্মাণ করেছিল সেটা তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হলো না। এদের মধ্যে অনেকেই আছে প্রচণ্ড ধর্মবিদ্বেষী অথচ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তাদের জন্ম।

এই উভয় শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা শিক্ষিতজনেরা একে অপরের প্রতি কাদা ছোঁড়াছুড়িতে লিপ্ত থাকেন, দিনকে দিন তাদের মধ্যে বিরাজিত বিদ্বেষ, অবিশ্বাসের ব্যবধান সরু নালা থেকে সাগরে পরিণত হচ্ছে। যেখানে এত বড় সঙ্কটে জাতি আজ নিমজ্জমান, তখন এরা উভয়েই একে অপরের ছিদ্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্ররা যখন জঙ্গিবাদী হামলা চালাচ্ছে তখন মাদ্রাসা শিক্ষিতরা আত্মতৃপ্তির হাসি দিয়ে বলছেন, এই হামলা যদি মাদ্রাসার ছেলেরা চালাতো তাহলে কেমন হতো? আবার কলেজ ভার্সিটি থেকে শিক্ষিতরা যখন দেখেন যে জঙ্গি হামলাকারীরা কোনো মাদ্রাসার ছাত্র তখনই তারা খুব সহজেই পূর্বধারণার ছকটি ইসলামের উপর বসিয়ে দেন। এই যে দ্বন্দ্ব, এর মূল কারণ দ্বিধাগ্রস্ত শিক্ষাব্যবস্থা, যে বিষবৃক্ষটি ব্রিটিশরা রোপন করেছিল।

জাতীয় জীবনের সাথে ব্যক্তি জীবনের সংঘাত

এ গেল শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব। এবার দেখা যাক জাতীয় জীবন থেকে ইসলামকে অপসারণ করার পরিণতি কী দাঁড়াল। ব্রিটিশদের কাছে পরাজিত হবার পর জাতীয় জীবনে আল্লাহর হুকুমের পরিবর্তে মুসলিমদের মেনে নিতে হলো ব্রিটিশদের হুকুম। এই যে ঘটনাটি ঘটল, এটা মুসলিমদের ক্ষেত্রে যতটা প্রবল সঙ্কট হয়ে দাঁড়াল তা কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে হয় নি। অন্যান্য ধর্মগুলো হাজার

হাজার বছরে এমনিতেই এতখানি বিকৃত হয়ে গেছে যে, তা দিয়ে কোনো জাতির সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করা সম্ভব নয়। অনেক ধর্মে তো জাতীয় জীবন পরিচালনার কোনো বিধানই নেই। কাজেই ঐসব ধর্মাবলম্বীদের জাতীয় জীবনে কার হুকুম চলছে বা না চলছে তা নিয়ে তাদের কোনো ঈমানী বাধ্যবাধকতাও নেই। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা। একটা জীবন্ত ইতিহাস রয়েছে ইসলামের। কিছুদিন আগেও মুসলিমরা দুনিয়া শাসন করেছে। একটি সুমহান সভ্যতার জন্মদাতা তারা। আবু বকর (রা.), ওমরের (রা.) শাসনামল নিয়ে মুসলমানরা আজও গর্ব করে। তারা এমন একজন মহামানবের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত যিনি মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বিস্ময়কর ইতিহাসের জন্মদাতা, যিনি ছিলেন একাধারে নবী, সেনাপ্রধান, সমাজ সংস্কারক, বিচারক। এই জাতির প্রাণশক্তি যে কোর'আন, তা হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেটা 'অপরিবর্তনীয়' ও 'অবিকৃত' আছে। সেখানে হাজার হাজার আয়াত রয়েছে মুসলিমদের জাতীয় জীবনের সাথে জড়িত। সেই আয়াতগুলোর বাস্তবায়ন করা মুসলিমদের ঈমানী বাধ্যবাধকতার অংশ। কিন্তু জাতীয় জীবনে হুকুম দেওয়ার ক্ষমতা যখন তারা হারাল তখন স্বভাবতই প্রশ্নের জন্ম হলো- এখন তারা কী করবে? তারা না পারল আল্লাহর হুকুম প্রত্যাখ্যান করে ব্রিটিশের হুকুম গ্রহণ করে নিতে, আবার না পারল ব্রিটিশের হুকুম প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করতে। শুরু হলো মুসলিমদের জাতীয় জীবনের সাথে ব্যক্তি জীবনের সংঘাত!

এরপর একটি সময় এল যখন পৃথিবীময় স্বাধীনতার দাবিতে একটার পর একটা আন্দোলন সৃষ্টি হতে লাগল। তুরস্ক, মিশর, ইরাক, লিবিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিস্তিন ইত্যাদি দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঢেউ খেলে গেল। ভারতবর্ষেও তাই, বাংলাদেশের জন্ম হলো জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও তার ভিত্তিতে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতারা কিন্তু ইসলামের চেতনার উপর নির্ভর করতে পারলেন না। কারণ তারা দেখলেন যে ইসলামের সঠিক কোনো রূপরেখা কোথাও নেই। হাজারো দল-উপদল, ফেরকা-মাজহাব, তরিকায় বিভক্ত হয়ে গেছে মুসলিম জাতি। তাদের একেক ভাগের আকীদা একেক রকম। লক্ষ্যের ঐক্য নেই, কর্মসূচির ঐক্য নেই। আর বৃহত্তর ধর্মবিশ্বাসী মানুষ ধর্মের প্রশ্নে স্থবির, অন্তর্মুখী মনোভাব লালন করে। সুতরাং কোথাও ভাষাকে ব্যবহার করে, কোথাও বর্ণকে ব্যবহার করে একটার পর একটা দেশ স্বাধীন হতে লাগল। দেশগুলোতে স্বাধীন সার্বভৌম সরকার গঠিত হলো, নতুন সংবিধান প্রণিত হলো, বিচারালয় গড়ে উঠল, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও সামরিক বাহিনী গঠিত হলো; জাতীয় আদর্শ হিসেবে কোথাও বেছে নেওয়া হলো ধর্মহীন সমাজতন্ত্র, কোথাও ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী গণতন্ত্র ইত্যাদি। আর ধর্ম যে অপাংক্তেয় ছিল, তাই রয়ে গেল।

কিন্তু ধর্মবিশ্বাসী মানুষের ঘরে ঘরে রইল কোর'আন, হাদীস, ফিকাহ ও ইতিহাসের বই। কোর'আনের সেই আয়াতগুলোর কী হবে যেগুলো রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত? তাছাড়া হাদীসে-সিরাতে বিশ্বনবীর রাষ্ট্রশাসনের যে দৃষ্টান্তগুলো রয়েছে যেগুলো মুসলিম জাতির জন্য পালনীয়- সেসবের বাস্তবায়ন কীভাবে হবে সে

প্রশ্নের কোনো সমাধান হলো না। আবার ইউরোপীয়রা আসার পূর্বে মুসলিমরা হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে যে রাষ্ট্রকাঠামো অনুযায়ী শাসিত হয়েছে, যে হুকুমগুলোকে আল্লাহর হুকুম বলে মান্য করাকে ঈমানী কর্তব্য মনে করেছে, কাজীরা আদালতে যে রায় দিয়েছেন, ফকিহরা কোর'আন-হাদীসের বিশ্লেষণ করে যে আইন তৈরি করেছেন, মুফতিরা যে ফতোয়া দিয়েছেন- সেই সবকিছুই কিন্তু গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত রয়েছে। আজও মাদ্রাসাগুলোতে লক্ষ লক্ষ ছাত্রকে সেগুলো পড়ানো হচ্ছে, পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে ও সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে। সেগুলো পড়েই মাদ্রাসা থেকে বের হচ্ছেন আলেম, মুফতি, ফকিহরা যাদেরকে মানুষ ইসলামের কর্তৃপক্ষ মনে করে। এই ফকিহ-মুফতিদের কাছে যখন মানুষ ইসলাম শিখতে যাচ্ছে তখন তারা অতীতের ঐ ফতোয়ার কিতাবগুলো থেকেই ফতোয়া দিচ্ছেন। অথচ তারা ভুলে গেছেন যে, ইতোমধ্যেই তারা শাসনক্ষমতা হারিয়ে বসে আছেন, সেই সাথে হারিয়েছেন ফতোয়া (রায়) দেওয়ার অধিকারও।

এখন সমস্যা দাঁড়াচ্ছে মানদণ্ডে। এমন একটি কাজ যা হয়ত শরীয়াহর দৃষ্টিতে গুরুতর অন্যায়, কিন্তু প্রচলিত আইনে তাকে অন্যায় মনে করা হচ্ছে না, কিংবা শরীয়াহ আইনে সেই অপরাধের শাস্তি একরকম, প্রচলিত আইনে ভিন্নরকম- সে ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসী মানুষ কার কথা শুনবে? মানদণ্ডের প্রশ্নে রাষ্ট্রের সাথে ধর্মবিশ্বাসী মানুষের এই দূরত্বকেই কাজে লাগাচ্ছে উগ্র মতাদর্শীরা। তারা সরকারকে, রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে তাগুত, মুরতাদ ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে ধর্মবিশ্বাসী মানুষকে উত্তেজিত করে তুলছে। ইসলামের জিহাদ ও কিতালের সাথে সন্ত্রাসকে গুলিয়ে ফেলছে। অথচ জিহাদ-কিতাল ও সন্ত্রাস সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়।

জিহাদ হচ্ছে যাবতীয় অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম। সেটা হতে পারে বক্তব্য দিয়ে, লিখে, যুক্তি, তর্ক করে ইত্যাদি নানাভাবে। একটি সমাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবার জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনগণের এমন সোচ্চার অবস্থান আবশ্যক। অন্যদিকে কিতাল হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ, যার জন্য রাষ্ট্রশক্তি আবশ্যক এবং একমাত্র রাষ্ট্রপ্রধানেরই অধিকার থাকে জাতিকে যুদ্ধ বা কিতালের আহ্বান জানানোর। আল্লাহর রসুল কিতাল করেছেন কিন্তু কখন?

যতদিন রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী হন নি, ততদিন রসুলাল্লাহ ব্যক্তি বা দলগতভাবে কোনোরূপ সশস্ত্র প্রতিরোধের চেষ্টাও করেন নি। মক্কায় নির্মম নির্যাতনের মুখেও কোনো সাহাবীকে অস্ত্র হাতে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় নি। তারপর যখন মদীনায় সার্বভৌম একটি জাতি গড়ে উঠল এবং আল্লাহর রসুল সেই জাতির রাষ্ট্রনায়ক হলেন, তখন তিনি তাঁর পদাধিকার বলে জননিরাপত্তার স্বার্থে বিভিন্ন 'কিতাল' পরিচালনা করেছেন। এরূপ প্রেক্ষাপটেই কোর'আনের যুদ্ধ, সন্ধি ইত্যাদি বিষয়ক আয়াতগুলো নাজেল হয়। বলা বাহুল্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কেবল ধর্মীয় আইনেই নয়, সব আইনেই বৈধ, স্বীকৃত।

কিন্তু ইসলামের জিহাদ ও কিতাল বিষয়ক এই নীতিমালা না বোঝার কারণে একটি শ্রেণি আজকে কোর'আন-হাদীসের অপব্যাখ্যা দিয়ে কার্যত সন্ত্রাসীপনায় লিপ্ত হচ্ছে। আরেকটি গোষ্ঠী ঈমান-আকীদা সংরক্ষণের কথা বলে রাজপথে প্রতিবাদ-

বিক্ষোভ, ভাঙচুর ইত্যাদি করছে, যেটা আল্লাহর রসুল ও তাঁর আসহাবগণ কখনই করেন নি।

এক্ষেত্রে সরকারের করণীয় কী?

এমতাবস্থায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের সরকারগুলোর মানসিকতা পশ্চিমা ধর্মহীন সমাজের সরকারগুলোর মতো হলে চলবে না। মনে রাখতে হবে- তারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন এমন একটি জনগোষ্ঠীকে, হাজার হাজার বছর ধরে যারা ধর্ম দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে, যাদের একটি অপরিবর্তিত ধর্মগ্রন্থ আছে, গৌরবগাঁথা ধর্মীয় ইতিহাস আছে, মহাবিপ্লব সৃষ্টিকারী একজন মহামানবের প্রচণ্ড গতিশীল জীবনের দৃষ্টান্ত আছে, যে কথা পূর্বেই বলে এসেছি।

এখন তাদেরকে একটি মৌলিক ও গুরুতর প্রশ্নের সুস্পষ্ট মীমাংসা করতে হবে যে, ধর্মকে, কোর'আনকে কী করা হবে? ধর্মকে কি মুছে ফেলা হবে? তা সম্ভব নয়। গত কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় ধর্মহীন বস্তুবাদী সভ্যতার শিক্ষাব্যবস্থা, গণমাধ্যম, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, প্রচার মাধ্যমে বহু চেষ্টা হয়েছে ধর্মকে নির্মূল করে ফেলার। কিন্তু সফল না হবার কারণ:

১. **স্রষ্টার রূহ:** মানুষের ভেতরে স্রষ্টার রূহ অর্থাৎ পরমাত্মার অংশ রয়েছে। সে অবচেতন মনেই আপন স্রষ্টাকে অনুভব করে, যে কোনো কষ্টে, সংকটে তাঁর কাছে আশ্রয় চায়।

২. **ধর্মগ্রন্থে সত্যের পরিচয়লাভ:** আল্লাহর নাজেলকৃত ধর্মগ্রন্থগুলো এখনও মানুষের কাছে আছে যেগুলো স্রষ্টার অস্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। মানুষ সেগুলো ভক্তির সঙ্গে পড়ছে, জানছে, বিচার বিশ্লেষণ করছে। সেগুলোর মধ্যে সত্য খুঁজে পাচ্ছে, যা তাদের হৃদয়কে প্রশান্তিতে ভরে তুলছে, তাদের আত্মার গভীরে প্রভাব ফেলছে। সুতরাং ধর্মগ্রন্থগুলোই ধর্মের রক্ষাকবচ, এমতাবস্থায় মানবজাতিকে ধর্মহীন করে ফেলার চেষ্টা হবে অপ্রাকৃতিক, বাস্তবতা-বিবর্জিত, অমূলক চিন্তা।

৩. **শান্তিময় অতীত ও ভবিষ্যদ্বাণী:** অতীতে হাজার হাজার বছর মানুষকে শান্তি দিয়েছে ধর্ম। সেই অনুপম শান্তির স্মৃতি কিংবদন্তির ন্যায় বংশ পরম্পরায় প্রতিটি সমাজে সভ্যতায় বিরাজিত আছে, ইতিহাসের পাতা থেকে বাদ দিলেও লাভ নেই। সময়ের সেই বিশাল ব্যাপ্তির তুলনায় গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র এবং এগুলোর অভিজ্ঞতাও শান্তিময় নয়। অধিকাংশ মানুষ এখনও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে একমাত্র স্রষ্টার বিধানেই শান্তি আসা সম্ভব। কাজেই যুগের হাওয়া তাদেরকে যতই অন্য দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুক, প্রচলিত ব্যবস্থাগুলোতে শান্তি না পেয়ে তারা ধর্মের দিকেই মুখ ফেরায়। উপরন্তু প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, আবার ন্যায়ের শাসনে শান্তি ফিরে আসবে। এই বিশ্বাস থেকে অধিকাংশ মানুষ সত্য ধর্মের উত্থানই কামনা করে।

৪. **ইসলামে জাতীয় জীবনবিধান রয়েছেঃ** ইসলামের সঙ্গে খ্রিষ্টধর্মের বড় একটি তফাৎ হলো ইসলামের জাতীয় জীবন পরিচালনার ব্যবস্থা রয়েছে। তাই মুসলিমদের মধ্যে জাতীয় জীবনে ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা সব সময়ই হয়ে আসছে, এটা খুবই স্বাভাবিক। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে তাই ধর্মকে বাদ দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সর্বতোভাবে স্বীকৃত হবে না যেটা ইউরোপ আমেরিকায় সম্ভব হয়েছে।

কাজেই ধর্মকে জাতীয় জীবন থেকে বাদ দেওয়ার চিন্তা পরিহার করে কীভাবে তা ইতিবাচক পথে ব্যবহার করা যায়, দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজে লাগানো যায় অর্থাৎ রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের সমন্বয় কিভাবে করা যায় সেটা নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। আর যদি ধর্মকে অবজ্ঞা করে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়, তাহলে মানুষের ধর্মবিশ্বাস বার বার স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী দ্বারা ভুল খাতে প্রবাহিত হয়ে জঙ্গিবাদ, ধর্মভিত্তিক অপরাজনীতি, ধর্মব্যবসা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উন্মাদনা ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে জাতিবিনাশী কাজে ব্যবহৃত হতেই থাকবে। সবখানে বলি হবে সাধারণ নিরীহ নির্দোষ মানুষ।

- *গত ৯ আগস্ট ২০১৬ তারিখে রাজধানীর পান্থপথে হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে আয়োজিত জঙ্গিবাদবিরোধী এক বিশাল র‍্যালি।*

সেই প্রকৃত আদর্শ হেযবুত তওহীদ তুলে ধরছে

এখানে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক- ইসলামের নামে বর্তমানে যে অন্ধত্ব ও কূপমণ্ডূকতা এই জাতির উপর চেপে বসেছে, ধর্মের নামে সেই অন্ধত্ব ও কূপমণ্ডূকতাকেই কি রাষ্ট্র গ্রহণ করে নিবে? না, আমাদের কথা সেটা নয়। প্রকৃত ইসলামে পশ্চাপদতার

স্থান নেই, অন্ধত্বের স্থান নেই। যে কোর'আন একদিন জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, সামরিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতায় এই জাতিকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছিল সেই কোর'আন কখনও পশ্চাদপদতা, কূপমণ্ডূকতা, কুসংস্কার ও অন্ধত্ব শিক্ষা দিতে পারে না।

আবার ইসলামের যত রূপ দাঁড়িয়ে গেছে রাষ্ট্র এর মধ্যে কোনটা গ্রহণ করবে তাও বিরাট প্রশ্ন। আমাদের কথা হচ্ছে, ইসলামের প্রকৃত আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। আর সেই আদর্শটি দিতে প্রস্তুত হেযবুত তওহীদ। সরকার যখন আহ্বান করছে দলমত নির্বিশেষে সবাই মিলে এগিয়ে আসার জন্য, তখন আমরা জাতির কল্যাণে এগিয়ে এসেছি, কাজ করে যাচ্ছি। আমরা গত একুশ বছর ধর্মের নামে চলা যাবতীয় অধর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার রয়েছি। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মাঠ পর্যায়ে আদর্শিক লড়াই করার অভিজ্ঞতাও আমাদের রয়েছে।

জঙ্গিবাদে আক্রান্ত হয়েছিল আফগানিস্তান, সিরিয়া, লিবিয়া, ইরাক ইত্যাদি দেশ। সে দেশগুলো এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে, কোটি কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে এখন মানবেতর জীবনযাপন করছেন। বাংলাদেশেও জঙ্গিবাদ হানা দিয়েছে, এই জঙ্গিবাদকে মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশকে কথিত 'সহযোগিতা' প্রদান করতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে আঞ্চলিক ও পাশ্চাত্যের পরাশক্তিধর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো। আমরা বলতে চাই, বাংলাদেশের সঙ্গে ঐ ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেশগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হচ্ছে, এখানে মহান আল্লাহ এই জঙ্গিবাদের সঠিক সমাধান প্রদান করেছেন যা দিয়ে আমরা এই অপশক্তিকে রুখে দিতে পারি।

সমাধান: ইসলামের প্রকৃত আকিদা

জঙ্গিবাদ নির্মূলের একমাত্র কার্যকরী পন্থা হচ্ছে, ইসলাম সম্পর্কে মানুষের আকিদা ঠিক করে দেওয়া। আকিদা হচ্ছে কোনো বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা (Comprehensive concept, correct idea)। অন্ধের হাতি দেখার ঘটনা সবাই জানেন। একজন অন্ধ হাতির পেটটা ধরে মনে করল হাতিটা একটি প্রাচীরের মতো। আরেকজন অন্ধ শুধু পা ধরে মনে করল হাতিটা একটি থামের মতো। আরেকজন হাতির শুঁড় ধরে মনে করল হাতিটা বুঝি অজগরের মতো। আরেকজন হাতির কান ধরে মনে করল হাতি একটি কুলার মতো। তারা সবাই হাত দিয়ে হাতিকে ধরে নিশ্চিত হয়েই তাদের অভিমত ব্যক্ত করল কিন্তু হাতি কি আদৌ তাদের বর্ণনার অনুরূপ? না। তাদেরকে যদি দৃষ্টিদান করা যায় তাহলেই তারা পূর্ণাঙ্গ হাতিটিকে একসাথে দেখতে পারবে এবং নিজেদের ভুল ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারবে।

একইভাবে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গভাবে এক নজরে পুরোটা দেখার ব্যর্থতার কারণে ইসলাম সম্পর্কে হাজার রকম ধারণা আমাদের মুসলিমদের মধ্যে বিরাজ করছে। কেউ ইসলামের নামে জঙ্গি কর্মকাণ্ড করছে আবার কেউ তার সম্পূর্ণ উল্টো অর্থাৎ বিকৃত তাসাউফ চর্চা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি

হাসিলের চেষ্টা করছে। যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে তাদের মধ্যেও রয়েছে বহু মত ও পথের বিরোধ। কেউ ধাপ্পাবাজির রাজনীতি করে রাষ্ট্রক্ষমতায় যেতে চাচ্ছে, কেউ চাচ্ছে সহিংস পন্থায় ক্ষমতা দখল করতে। এখন কোনোভাবে যদি তাদের সামনে আল্লাহ রসুলের প্রকৃত ইসলামের পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি অর্থাৎ ইসলামের প্রকৃত আকিদা (Comprehensive Concept) তুলে ধরা যেত তাহলে তারা নিজেদের যার যার বিকৃত অবস্থান থেকে ফিরে প্রকৃত ইসলামের পথে ফিরে আসতে পারতো।

ইসলামের পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি এক নজরে না দেখতে পারায় আরেকটি বড় সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে যে, ইসলামের কোন কাজটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোনটা কম গুরুত্বপূর্ণ, কোনটা আগে কোনটা পরে, কোন আমলের পূর্বশর্ত কী তা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এর পরিণাম এই হয়েছে যে ইসলামের নামে একেক জন একেক দিকে ডাকছেন, সাধারণ মানুষ দিশেহারা। এ জন্যই ফকিহরা, ইমামরা সকলেই একমত যে আকিদা ভুল হলে ঈমান অর্থহীন অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা সঠিক না হলে ঈমান ও সমস্ত আমল নিষ্ফল। আজকে ঈমানকে ভুল খাতে প্রবাহিত করেই বিভিন্ন জাতিবিনাশী কর্মকাণ্ড করা হচ্ছে এবং সবকিছুই করা হচ্ছে ইসলামের নাম দিয়ে, কোর'আনের আয়াত, হাদীস, রসুলের জীবন থেকে উল্লেখ করেই।

যেমন- পবিত্র কোর'আনে শত শত আয়াতে বলা হয়েছে জেহাদ করতে। সুতরাং জেহাদ মুসলিমদের জন্য ফরদ। কিন্তু এই জেহাদ কাকে বলে, এই জেহাদের আওতায় কী কী আসে, জেহাদ ও যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য কী, যুদ্ধ কখন বৈধ হবে, যুদ্ধ আর সন্ত্রাসের মধ্যে পার্থক্য কী এগুলো না জানা থাকলে কোর'আনের কিছু আয়াত বা হাদীস উল্লেখ করে সহজেই মানুষের ঈমানকে হাইজ্যাক করে ভুল পথে কাজে লাগানো যায়। আর এভাবেই একজনকে জঙ্গিবাদী কাজে সম্পৃক্ত করে ফেলা যাচ্ছে, তাকে দিয়ে মানুষ হত্যা করানো যাচ্ছে। ঈমান থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই তারা কিন্তু এই সহিংস কাজটি করছে। জেহাদ সম্পর্কে আকিদা সঠিক না হওয়ার কারণেই তার ঈমানকে ভুল খাতে প্রবাহিত করা হলো, জেহাদের মতো একটি পবিত্র আমলও সন্ত্রাসে পরিণত হলো। তারও কাজে আসল না, মানুষেরও উপকার হলো না। বরং অন্যায় আরো বৃদ্ধি পেল। আরো মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলো। ইসলামের উপর সন্ত্রাসের কলঙ্ক লেপন করা হলো, মানুষের মধ্যে ইসলামে প্রতি অনাস্থা ও ঘৃণা বৃদ্ধি পেল।

এখন একটাই করণীয় আপামর সাধারণ জনতাকে ইসলাম সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা বা আকিদা সঠিক করে দেওয়া যেন তারা কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ভুল পথে না যায়। যেন তারা বুঝতে পারে যে, মানুষের ক্ষতি হয় এমন কোনো কথা কাজ বা চিন্তা সবই গোনাহের কাজ। আর

মানুষের তথা মানবজাতির উপকার হয় বা কল্যাণ হয় এমন কথা কাজ বা চিন্তা সবই সওয়াবের কাজ। তাই একটি কাজের আগেই তারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সঠিক পথ ও ভুল পথ নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারবে। তারা এটাও বুঝতে সক্ষম হবে যে, কোনটা ইসলামের কাজ আর কোনটা ইসলামের কাজ নয়, ইসলামের কোন কাজটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বা মুখ্য আর কোন কাজটি গৌণ বা কম গুরুত্বপূর্ণ।

- *গত ২ আগস্ট ২০১৬ তারিখে বগুড়ার গাবতলী উপজেলার দুর্গাহাটা ইউনিয়নে হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে আয়োজিত জঙ্গিবাদবিরোধী মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন সর্বস্তরের স্থানীয় জনতা।*

ঐক্যবদ্ধ হতে হবে কীসের ভিত্তিতে?

এটা সবাই উপলব্ধি করছেন যে জাতিকে এখন ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে। এমতাবস্থায় সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, এই ঐক্য হবে কীসের উপরে। এটা জানা কথা যে ঐক্য অনৈক্যের উপর শক্তিশালী। এত বড় একটি বৈশ্বিক সংকট, একে জাতির ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ছাড়া আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর একার পক্ষে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। স্বাধীনতার পর থেকে বিগত ৪৫ বছরে আমাদের জাতিটিকে ধর্মীয়ভাবে, রাজনৈতিকভাবে শত শত ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। দেশের সংকটকালে তাদের মধ্যে বিরাজিত এই বিভক্তিরেখাগুলো মুছে দিয়ে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা একান্ত অপরিহার্য, নয়তো দেশই থাকবে না। এই ঐক্য হতে হবে সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে। সেটা সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, অপরাজনীতি, দুর্নীতি ইত্যাদি যাই হোক

না কেন - যেটা অন্যায় সেটাকে অন্যায় বলতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে সবাইকে রুখে দাঁড়াতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে একেকজন একেকটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে চলবে না। আমরা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালাম ঐদিকে গণতান্ত্রিক অধিকারের নামে জ্বালাও-পোড়াও চলবে, অপরাজনীতি চলবে, হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হতে থাকবে, দেশজুড়ে দুর্নীতি, চাঁদাবাজি চলতে থাকবে, তাহলে জঙ্গিবাদ দূর হবে না। কোনো অন্যায় আপাতদৃষ্টিতে ছোট হলেও সেটাকে অবজ্ঞা করা যাবে না, কারণ সেটা থেকে হাজারো অন্যায়ের জন্ম হবে। সমস্ত অন্যায়ের নিচে চাপা পড়ে সমাজ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরবে। এটাই সব ধর্মের মূল কথা। ইসলামের কলেমা - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হচ্ছে এটাই, সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীনভাবে সত্যকে ধারণ করা। আমরা হেযবুত তওহীদ মানুষের সামনে তাদের মুক্তির জন্য এই সহজ সরল পথটি তুলে ধরছি। আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তওফিক দান করুন।